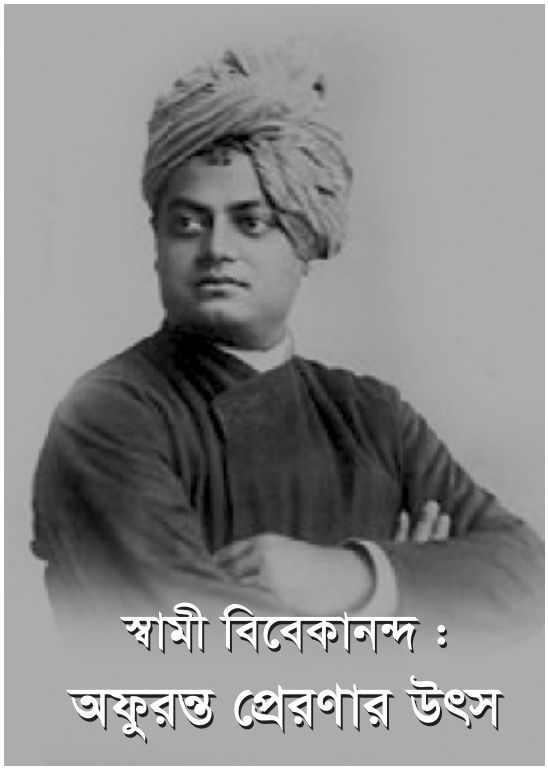

# স্বামী বিবেকানন্দ : অফুরন্ত প্রেরণার উৎস

**কবীর চৌধুরী**

*"ক্ষুধার্ত জনগণকে ধর্ম উপদেশ দেওয়া অবমাননাকর। ক্ষুধার্ত লোককে অতীন্দ্রিয়বাদ শিক্ষা দেওয়া অপমান করার শামিল।" - বিবেকানন্দ*

যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করেন যে, শিক্ষক স্যার রামকৃষ্ণ এবং ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কে বেশী শ্রেষ্ঠ ? প্রাথমিকভাবে এর আমি কোন উত্তর দেব না। উভয়েই যার যার পরিমণ্ডলে মহান ব্যক্তি কাজেই এ ব্যাপারে কোন তুলনা করা অবাস্তব এবং অপ্রত্যাশিত। যদি প্রশ্নকর্তা নাছোড়বান্দা হন এবং জিজ্ঞাসা করেন কাকে আমি গ্রহণ করব তাহলে আমি নির্দ্বিধায় উত্তর করবো স্বামী বিবেকান্দকে। তিনি ছিলেন কর্মে বিশ্বাসী মানুষ, আর স্যার রামকৃষ্ণ ছিলেন স্বজ্ঞাত উপলব্ধির অধিকারী। আমি জানি যে, কর্মকে প্রযোজ্য এবং উপযোগী হতে হয় এবং এর পেছনে থাকে সতর্ক চেতনা। চূড়ান্তভাবে যা আমাকে আকর্ষণ করে তাহলো ঝড় ও চাপের মধ্যে কিংবা ঘাম ও রসের মাঝে যে কর্ম এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক মহান কর্মকাণ্ডের মানুষ এবং তাঁর কর্ম ছিল নিজের চোখে দেখা বাস্তবতার ওপর দাঁড়ানো। তাঁর নিজস্ব অর্ন্তদৃষ্টি ছিলো।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে ১৮৬৩ সালের ১১ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্ম। বিবেকানন্দ হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ তাঁর সময়কার অন্যান্য অনেক যুবকদের মত অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ব্যাপারে অবিশ্বাসী ছিলেন। রামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক ক্ষমতার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের সাথে স্বাক্ষাতের পর একজন নিরক্ষর সহজ সরল ও সন্ততুল্য মানুষের ঈশ্বর, মনুষ্য প্রকৃতি ও নিয়তি সম্পর্কে তার অবলোকন দেখে নরেন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাবনায় পরিবর্তন আসে, বলা যায় তিনি একজন নতুন মানুষে পরিণত হলেন। তিনি রামকৃষ্ণের এক পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি ধ্যান করার পন্থা অবলম্বন করলেন না। তাঁর আত্মাকে ঈশ্বরের আত্মার সাথে একীভূত করার জন্য সংগ্রাম করেননি। অর্থাৎ মার্কিন অতিপ্রাকৃতবাদী এমার্সনের মতে যা হলো পরমাত্মা। তিনি তাঁর দেশের লাখো লাখো মানুষ যারা মানবেতর জীবন–যাপন করছিলেন তাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলেন।

তাঁর দুই ধর্মভাই ব্রহ্মানন্দ এবং তুরিয়ানন্দকে তিনি লিখলেন– "আমি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ভাইয়েরা, আমার নিজ চোখে জনগণের যে ভয়াবহ দারিদ্র্য এবং কষ্ট আমি দেখেছি তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। এ ধারণা আমার বদ্ধমূল যে এদের দারিদ্র্য এবং দুঃখ-কষ্ট দূর না করে এদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করা অর্থহীন।"

জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে তিনি দেশের যুব সমাজকে মূল ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান করলেন। বিবেকানন্দ লিখলেন "আমরা দু'হাজার নারী পুরুষ সম্বলিত সন্ন্যাসী চাই, শিক্ষিত যুবকদের চাই, মূর্খদের নয়।" অপর এক জায়গায় উনি লিখেছেন, "শত সহস্র নারী ও পুরুষ পবিত্রতার ভাবাবেগে প্রজ্জ্বলিত হয়ে, ঈশ্বরের প্রতি শাশ্বত বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এবং সিংহের সাহসের স্নায়ু নিয়ে দরিদ্র, সমাজ এবং সর্বহারাদের প্রতি সমবেদনা নিয়ে দেশের আনাচে কানাচে মুক্তির বাণী নিয়ে, সমাজ বিপ্লবের বাণী নিয়ে এবং সাম্যের বাণী নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।"

১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ যখন বিশ্বধর্ম সংসদের অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন তখন তার এক ভক্তকে লিখেছিলেন "ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অধঃপতিত এবং দারিদ্র্যক্লিষ্ট, পুরোহিত কর্তৃক নিগৃহিত এবং অত্যাচারিত জনগণের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত রাত-দিন

প্রার্থনা করা। আমি অতীন্দ্রিয়বাদী নই, দার্শনিক নই কিংবা সাধুসন্তও নই। আমি দরিদ্র কিন্তু আমি দারিদ্র্যকে ভালবাসি ... ভারতবর্ষের দুই কোটি দারিদ্রক্লিষ্ট এবং অজ্ঞ মানুষের দুঃখ-কষ্ট কি কেউ অনুভব করে? কীভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? কে তাদের আলোর পথ দেখাবে? এই সমস্ত জনগণই হোক তোমাদের ঈশ্বর ...। আমি তাঁকেই একজন মহাত্মা বলি যাঁর অন্তর দরিদ্রদের জন্য কাঁদে। যতোদিন এই সব লক্ষ লক্ষ লোক অনাহার এবং অজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকবে ততদিন আমি মনে করি যে, এদের অর্থে শিক্ষিত হওয়া প্রতিটি মানুষ যারা এদের জন্য ভাবে না তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাসঘাতক।"

ভারতের জাতিভেদ প্রথার এবং নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপর উচ্চবর্ণের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নির্যাতনের কড়া সমালোচক ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি মতলববাজ ভণ্ড ধর্মীয় কর্মীদের, যাঁরা মানবপ্রেমের ধর্মকে একটা ব্যবসায়ে পরিণত করেছে তাদেরও সমান সমালোচক ছিলেন। তিনি সকল ধরনের গোড়ামিপূর্ণ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে যুবক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী লেখক এবং উদার মানবতাবাদী রম্যা রোঁলা তাঁর 'বিবেকাননেন্দের জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন– "শিশুর স্বাধীনতাকে তাঁর থেকে কেউ কঠিনভাবে রক্ষা করেননি। তাদের আত্মা তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতই সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। শিশুর আত্মাকে অবরুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ, যা আমরা প্রতিনিয়তই করছি।" তারপর রোঁলা বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করেন, "আমি তোমাদের কোন কিছুই শিখাতে পারব না। তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে শিক্ষিত করবে। আমি হয়তো ঐ সকল চিন্তা-ভাবনায় তোমাদের প্রকাশ্যে কিছুটা সহায়তা করতে পারি। আমি আমার নিজেকে ধর্মশিক্ষা দিতে পারি। আমার পিতা কিংবা শিক্ষকদের কি অধিকার আছে আমার মস্তিষ্কে ঐ সব বাজে ধারণা দেবার? হয়তো সেগুলি সঠিক কিন্তু তা আমার উপযোগী নাও হতে পারে। আজকের পৃথিবীর সকল আত্মঘাতী হীনতার কথা স্মরণ করুন, লক্ষ লক্ষ অবুঝ শিশু কীভাবে ভুল শিক্ষার জন্য বিকৃত হচ্ছে। পারিবারিক ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম কিংবা অন্যান্য ভয়াবহ বিশ্বাসের জন্য কতগুলো সুন্দর ধর্মবিশ্বাস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে? ভেবে দেখুন, আপনার শৈশবের ধর্ম বা দেশীয় ধর্মের কি পরিমাণ কুসংস্কার মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তা কি পরিমাণ ক্ষতিকারক বা ক্ষতি করতে পারে....।"

বিবেকানন্দ সব ধরনের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন। তাঁর আচরণ আমাকে টম পেইনের কথা মনে করিয়ে দেয়, তিনিও সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও তাই। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আত্মাই হচ্ছে পবিত্র ধর্মীয় স্থান– এটাই মদীনা, কাবা, বারানসী, বুদ্ধগয়া কিংবা জেরুজালেম। মানুষের আত্মা থেকে পবিত্র আর কিছুই নাই। বিবেকানন্দ পরিস্কার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন "চার্চের যতো খুশী তাদের সুসমাচার, তত্ত্বসমূহ কিংবা দর্শন চর্চা করুক কিন্তু প্রকৃত ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার অধিকার কোন চার্চেরই নেই।"

রোঁলা বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করেন, "বিবেকানন্দ কেন শিক্ষা নিয়ে এতটা ব্যস্ত থাকেন এবং শিক্ষকের কি পরিণতি?" রোঁলা নিজের উত্তর নিজেই প্রদান করেন এই বলে যে, একজন সত্যিকার শিক্ষক হলেন একজন মুক্তিকামী যিনি প্রত্যেককেই নিজস্ব ক্ষমতা এবং নিজের মত করে কাজ করতে দেন, সেইসাথে তার সহযোগীদের কাজের পদ্ধতির সঞ্চালনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বিবেকানন্দের ভাষায় "আদর্শ অনেক ধরনের হতে পারে। আপনার আদর্শ কী হবে তা নির্ধারণ করে দেবার অধিকার আমার নেই কিংবা আমার আদর্শ আপনার উপর জোড় করে চাপিয়ে দেওয়াও সঠিক নয়। আমার দায়িত্ব সকল ধরনের আদর্শ আপনার কাছে তুলে ধরা যাতে আপনার বিচার-বিবেচনায় আপনার নিকট সবচেয়ে মঙ্গলকর এবং গ্রহণযোগ্যটি আপনি বেছে নিতে পারেন।"

বিবেকানন্দ সব ধরনের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন। তাঁর আচরণ আমাকে টম পেইনের কথা মনে করিয়ে দেয়, তিনিও সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও তাই। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আত্মাই হচ্ছে পবিত্র ধর্মীয় স্থান– এটাই মদীনা, কাবা, বারানসী, বুদ্ধগয়া কিংবা জেরুজালেম। মানুষের আত্মা থেকে

পবিত্র আর কিছুই নাই। বিবেকানন্দ পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন "চার্চের যতো খুশী তাদের সুসমাচার, তত্ত্বসমূহ কিংবা দর্শন চর্চা করুক কিন্তু প্রকৃত ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার অধিকার কোন চার্চেরই নেই।"

এই সব ব্যাপার পুরোটাই হচ্ছে ঈশ্বর এবং আত্মার মধ্যে সীমিত। ধর্মের গভীরতম মর্ম সাধারণভাবে প্রকাশ করা যায় না। বিবেকানন্দ বলেছেন– "আমার ধর্মীয় অনুভূতিগুলো এক নিমেষে তৈরি করতে পারি না। এই মূকাভিনয় এবং ভণ্ডামির ফলাফল কি? এটা ধর্মের নামে তামাশা এবং অত্যন্ত নিম্নমানের ব্লাসফেমি....। কিভাবে মানুষ ধর্ম নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি সহ্য করবে? এটা অনেকটা সেনা ছাউনিতে অবস্থিত সৈন্যদের মতো : অস্ত্র কাঁধে হাঁটু গেড়ে বসে একটা বই নেওয়ার মতো- পুরোটাই যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। পাঁচ মিনিটের অনুভূতি, পাঁচ মিনিটের যুক্তি এবং পাঁচ মিনিটের প্রার্থনা পুরোটাই পূর্বসজ্জিত। এই পদচারণা ধর্মকে দূর করে ছেড়েছে এবং এটা যদি শতাব্দী ধরে চলতে থাকে তবে ধর্ম বলে আর কিছু থাকবে না।" বিবেকানন্দের উপরোক্ত বক্তব্য রমা রোঁলার পূর্বে উল্লিখিত পুস্তকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

রোঁলা বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরম আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপন করা। "শক্তি, যুক্তি, জাগতিক বস্তুসমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং পুরোপুরি অনুৎসাহিতা-ই হচ্ছে এই লক্ষ্যে পৌঁছবার শর্ত।" রোঁলা বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন "মন্দির কিংবা চার্চ, বই–পত্র ইত্যাদি হচ্ছে ছেলেখেলার সামগ্রী। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক মানুষকে আরো একধাপ উন্নীত করার প্রচেষ্টা।"

বিবেকানন্দ মানুষকে ধর্মের অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম মানুষের জন্য, এর উল্টোটি নয়। তিনি নিজেকে জনগণের একান্ত কাছের মানুষ হিসাবে ভাবতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ পরিভ্রমণের পর মাদ্রাজে এক সংবর্ধনা সভায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন "আমি জনগণের মানুষ, আমি জনতার সেবক এবং আমার হৃদয় ওখানেই ছুটে যায়।" তিনি ভারতের জন্য সাম্য এবং বৈষম্যহীন এক নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর আদর্শ কিছুটা সমাজতান্ত্রিক। যদিও তিনি সমাজতন্ত্রকে কখনোই ত্রুটিমুক্ত আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করতেন না। তাঁর এক প্রবাসী ভক্তের নিকট চিঠি লিখে বিবেকানন্দ জানিয়ে ছিলেন, "আমি একজন সমাজতান্ত্রিক এই ভেবে নয় যে, ওটা একটা সঠিক সমাজব্যবস্থা তাকে এই ভেবে যে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।" দেশে এবং বিদেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেশ কয়েকটি সভায়, শুদ্রদের শাসনের কথা বলেছেন যা কিনা সমাজের অবহেলিত এবং নিম্নস্তরের মানুষদের শাসন অর্থাৎ বামপন্থীদের ভাষায় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব। তিনি বলেছেন সমাজ চার ধরনের শ্রেণী দিয়ে শাসিত হয়: যাজক (ব্রাহ্মণ), যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়), বণিক (বৈশ্য) ও শ্রমিক (শুদ্র)। প্রথম শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা শেষ হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর শাসনব্যবস্থার দিন আগত। তিনি এই ব্যবস্থা কোথায় আবির্ভাব হবে তারও কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৮৯৬

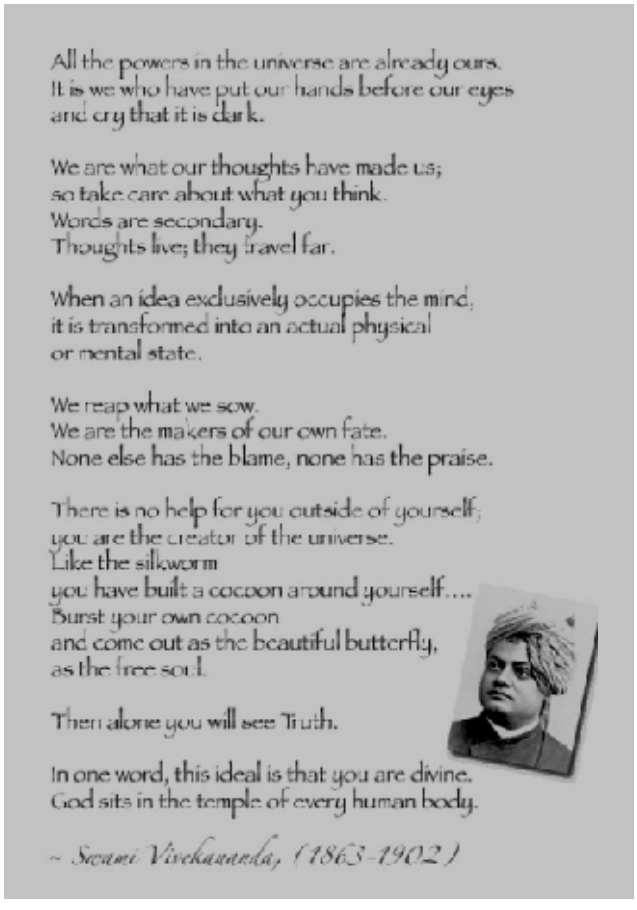

সালে সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখিত এক পত্রে বলেছেন যে, এই নবযুগ হয় রাশিয়া কিংবা চীনে আবির্ভাব হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর একুশ বছর পর রাশিয়ায় এবং তিপ্পান্ন বছর পর চীনে কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়, সময়ের সাথে সাথে এটা ভিয়েতনাম, কিউবা, উত্তর কোরিয়া ও ভেনেজুয়েলাতে আবির্ভূত হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী এখন বৈশ্যদের অর্থাৎ বণিক শ্রেণীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই এখন মুক্তবাজার অর্থনীতিই হচ্ছে আদর্শিক ঈশ্বর এবং আমরা এও জানি যে, পৃথিবীর অনেক অংশেই তাদের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য কীভাবে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে যাতে তারা নির্মমভাবে কমিউনিজমের বিস্তার রোধ করতে পারে।

বিবেকানন্দের বিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতার উল্লেখ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে কোন লেখাই সম্পূর্ণ হয় না। ১৮৯৩ সালে বিশ্বধর্ম পরিষদের সভায় অংশগ্রহণের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর কলম্বাস হলে বিবেকানন্দ বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল সহনশীলতা, আন্তঃধর্মীয় মিল এবং সেক্যুলার ধর্মানুভূতির এক চিরস্থায়ী অনুপ্রেরণার উৎস।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে বিবেকানন্দ বলেন, "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামী এবং এর ভয়ানক পরিণতিতে অন্ধ গোঁড়ামীর এক সুন্দর পৃথিবী দীর্ঘদিন আচ্ছাদিত ছিল। এই পৃথিবীকে তারা হিংসা দিয়ে পূর্ণ করেছে। প্রায়শই মনুষ্য রক্ত দিয়ে ভিজিয়েছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং সকল দেশকে দুর্দশা ও হতাশায় ঠেলে দিয়েছে। এ সকল ভয়ানক দানবকুলের অবর্তমানে এই মানবসমাজ আরও অগ্রসর হতে পারতো। কিন্তু তাদের সময় এসেছে। আমি আন্তরিকভাবে মনে করি যে এই সম্মেলনের সম্মানে আজ সকালে যে ঘন্টা বেজেছে তা যে এই গোঁড়ামী এবং অন্ধত্বের ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য অস্ত্র কিংবা কলমের মাধ্যমে শাস্তি অথবা বাধা এই লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করছে তাদের নির্মম মৃত্যু ঘন্টা হয়ে উঠুক।"

এটা ছিল আদর্শের বাণীতে পরিপূর্ণ কিন্তু বাস্তবতার দিকে নির্দেশিত একটি অসাধারণ বক্তৃতা। এতে সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তার দিকে আলোকপাত করা হয়েছে এবং অন্ধত্ব ও গোঁড়ামীর সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে তাঁর বক্তৃতার প্রায় শত বৎসর পরেও বিবেকানন্দের এই আশা পূরণ হয়নি। ভিন্নমত

তিনি এই ব্যবস্থা কোথায় আবির্ভাব হবে তারও কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৮৯৬ সালে সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখিত এক পত্রে বলেছেন যে, এই নবযুগ হয় রাশিয়া কিংবা চীনে আবির্ভাব হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর একুশ বছর পর রাশিয়ায় এবং তিপ্পান্ন বছর পর চীনে কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এটা ভিয়েতনাম, কিউবা, উত্তর কোরিয়া ও ভেনেজুয়েলাতে আবির্ভূত হয়।

পোষণ করার কারণে মুক্ত চিন্তার মানুষ এবং সেক্যুলার ভাবনার শক্তি ধর্মান্ধ ও জঙ্গী মৌলবাদীদের দ্বারা সহিংস আক্রমণের শিকার হয়। আমাদের এই উপমহাদেশে আমরা গভীর দুঃখ, ক্রোধ এবং পরিতাপের সাথে বিভিন্ন উগ্র মৌলবাদী সংগঠনগুলোর নোংরা কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করি। যেমন বাংলাদেশে হিজবুত তৌহিদ, খতমে নবুয়াত এবং জামায়াতে ইসলামী। ভারতে রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘ, শিবসেনা ও বজরংদল ও পাকিস্তানে আঞ্জুমান সিপাহী সাহাবা, মারকাজে দাওয়াতুল ইসলাম ও লস্করে তৈয়্যেবা যারা শত ধরনের ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে বেড়ায়।

১৮৯৩ সালের শিকাগোর কলম্বাস হলে আয়োজিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিবেকানন্দ বেশ কয়েকবার বক্তব্য রেখেছেন এবং প্রতিবারই তিনি সমবেদনা, দয়া ও ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ মিলগুলোর উপর আলোচনা করেছেন। ১৮৯৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি বলেন "খ্রিস্টানকে হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ হতে হবে না কিংবা কোন হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না। কিন্তু সবাই একে অপরের মূল চেতনাকে উপলব্ধি করবেন তথাপি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবেন এবং প্রচলিত উত্তরণের নিয়মেই উন্নতি লাভ করবেন।" তিনি আরো বলেছেন, "যদি ধর্ম সম্মেলন পৃথিবীকে কিছু প্রদর্শন করে থাকে তা হলো এই। পবিত্রতা, শুদ্ধতা এবং দয়া পৃথিবীর কোন চার্চের একক সম্পত্তি নয় এবং প্রতিটি

পদ্ধতিই অসাধারণ চরিত্রের মানব-মানবী তৈরি করেছে। এই দৃষ্টান্তের সম্মুখে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে থাকেন যে, অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাসের অবলুপ্তির মধ্যে শুধু তার ধর্মই বিকশিত হবে তাহলে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করুণা করি এবং তাদেরকে বলতে চাই যে, সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সকল ধর্মের ব্যাপারে সহসাই লিখা থাকবে "সহায়তা করুন– বিবাদ করবেন না, সম্প্রীতি ও শান্তি, বিরোধ নয়।"

বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ তার বক্তৃতায় এই মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। তিনি সকলকে ধর্মব্যবসায়ীদের হীন চক্রান্তের বিষয়ে হুঁশিয়ার করেন- যারা ঈশ্বর এবং ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যেকার মাধ্যম হিসাবে নিজেদের জাহির করেন। তিনি বলেন "আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি– তিনি হলেন সকল সৌন্দর্য্যের আধার এবং শ্রেষ্ঠত্বের উৎস।" বিবেকানন্দ আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। তার মহান অবদান হলো- ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের প্রতিষ্ঠা। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের সেবা করা এবং শিক্ষার প্রসার। শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষা নয়, সেক্যুলার শিক্ষা এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষা। প্রিয়জনদের প্রতি তাঁর বাণী ছিল নিম্নরূপ।

- সৃষ্টিকর্তার নিকট পৌঁছাতে হলে অপরের মুক্তি চাও। নিজের ব্যাক্তিগত মুক্তির প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর।
- দরিদ্র, নিরক্ষর, অজ্ঞ, উৎপীড়িত– এরাই হচ্ছে তোমাদের ঈশ্বর। জেনে রাখো এদের সেবা করাই হচ্ছে– তোমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দকে আমার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নায়ক বলে মনে করি। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি তাঁর সাহসিকতার জন্য। তাঁর অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস এবং তাঁর কর্মমুখী মানসিকতার জন্য। আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর অনাবিল দেশপ্রেম ও স্বদেশের উন্নত ঐতিহ্যের প্রতি তার গভীর ভালবাসার জন্য। আমি শ্রদ্ধা করি তাঁকে তাঁর জানার প্রতি আগ্রহ এবং শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। ভণ্ডামীপূর্ণ নীতিবাক্যের প্রতি তাঁর ছিল ঘৃণা এবং কুসংস্কার ও অন্ধত্বের প্রতি তার ছিল নিরন্তর সংগ্রাম।
ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছেন "উনি যদি না জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে হাজার হাজার মানুষের কাছে জীবনের মূল্য বিভিন্ন বিদ্বৎজনের ধোঁয়াটে বিবাদের মধ্যেই আটকে থাকতো। তিনি প্রজ্ঞার সাথে শিক্ষা দিয়েছেন অপরাপর পণ্ডিতদের মতো নয়। তিনি নিজে উপলব্ধির গভীরে গিয়ে তাঁর বিশ্বাস চর্চা করেছেন এবং রামানুজের মতই ফিরে এসেছেন অস্পৃশ্য ও শ্রেণীচ্যুত মানুষদের কাছে।"

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বিবেকানন্দের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪০ বছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী অসাধারণ সমৃদ্ধ সম্পদ তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এখন আমি বিবেকানন্দের আরো একটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করতে চাই যা আমরা সচরাচর উপেক্ষা করে থাকি। তিনি একজন অসামান্য মানের কবি ছিলেন। তার ইংরেজিতে লেখা কিছু কবিতা অত্যন্ত উঁচু মানের সাহিত্যমূল্য-সম্পন্ন। যে কবিতাটিকে উল্লেখ করে আমি আমার এই নিবন্ধ শেষ করতে চাই তার শিরোনাম হলো- 'দি সংস্ অব দি ফ্রি (The songs of the Free)'। এই কবিতাটিতে হয়তো তাঁর অপরাপর কবিতার মতো লম্বা দোলার মিল্টনিয় পয়ার নেই কিন্তু এটা অতীন্দ্রিয় আভাস, গভীর অনুভূতি এবং তীব্র আবেগে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কবিতাটি এই রকম :–

*The Song of the Free*

Before the Sun, the Moon, the Earth,
Before the stars of comets free,
Before e'en Time has its birth,
I was, I am and I will be.
The beauteous earth, the glorious sun,
The calm sweet moon, the spangled sky,
Causation's laws do make them run,
They live in books, in bonds they die

And mind its mantle dreamy net.
Casts o'er them all and holds them fast
In warp and woof of thought are set,
Earth, hells and heavens, or worst, or best,
Know these are but the outer crust-
All space and time, all effect, cause.
I am beyond all sense, all thought,
The witness of the Universe!
Not two or many, its but one.
And thus in me all one's I have,
I cannot hate, I can not....!
Myself from....-I can but love!
From dream awake, from bonds be free,
Be not afraid, this mystery,
My shadow cannot frighten me!
Know once for all that I am He!

*অনুবাদ: কাওসার চৌধুরী*

*অধ্যাপক কবীর চৌধুরী: আমাদের সাংস্কৃতিক ও নাট্যজগতের এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব।*